ইয়াহিয়া-মুজিব-ভূট্টোর ব্যর্থ আলোচনা এবং শেখ মুজিবের যুদ্ধাপরাধ

ফিরোজ মাহবুব কামাল

অবিশ্বাসের রাজনীতি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেকায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের মাঝে একতা এবং পারস্পারিক বিশ্বাসের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সে নীতির ভিত্তিতেই ভারতের বহু ভাষা,বহু বর্ণ ও বহু মজহাবে বিভক্ত মুসলমানদের মাঝে তিনিএকতাগড়েছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা-অবধি সে একতা ও বিশ্বাস অটুট ছিল।ফলে বাঙালী,আসামী,পাঞ্জাবী,সিন্ধি,পাঠান,বিহারী,গুজরাতী এরূপ নানা ভাষার শিয়া-সূন্নী-দেওবন্দি-বেরেলভী মুসলমানেরা তাঁকে অবিসংবাদিত নেতা রূপে বরণ করে নেয়। ভারতীয় উপমহাদেশের বহু শত বছরের মুসলিম ইতিহাসে এমন একতা আর কোন কালেই এভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। কায়েদে আযম এক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় নেতা। একতার শক্তিঅসামান্য। আর সে একতার বলেই তিনি ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ও সংখ্যাগরিষ্ট হিন্দুদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সর্মথ হন।

তবে মুসলমানদের ইতিহাসে যেমন নানা ভাষা,নানা অঞ্চল ও নানা বর্ণের মানুষের মাঝে সীসাঢালা দেয়ালের মত অটুট ঐক্যর ইতিহাস আছে. তেমনি রক্তাত্ব সংঘাতের ইতিহাসও আছে। মুসলমানদের মাঝে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধই ভাতৃঘাতি। সেরূপ ঘটনা যে কেবল হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)এবং তার পুত্র এজিদের হাতে ঘটেছে তা নয়। পরেও বহুবার ঘটেছে। এরূপ ভাতৃঘাতিসংঘাত যে কীরূপে আল্লাহর আযাব ঢেকে আনে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা যেচিত্রটি বার বার তুলে ধরেছেন বনি ইসরাইলের ইতিহাস থেকে। সমগ্র মানব জাতির জন্য সেটি এক শিক্ষণীয় দিক। তারা নিজেরা নানা গোত্রে বিভক্ত হয়েছে এবং নিজ হাতে নিজেদের নবীদেরকে হত্যা করেছে। এমন কি হযরত ঈসা (আঃ)এর মত মহান নবীকে রোমান কাফেরদের হাতে তুলে দিয়েছে,এবং তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যার জন্য জেরুজালেমের রোমান শাসকের উপর চাপও দিয়েছে। একই রূপ সংঘাতের দিকে দ্রুত এগুতে থাকে পাকিস্তানের রাজনীতিও। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র এক বছর এক মাস পর কায়েদে আযমের ইন্তেকাল ঘটে। তার মৃত্যুর কিছুদিন পরই রাওয়ালপিণ্ডির এক জনসভায় আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং দ্বিতীয় গুরুত্বর্পূণ ব্যক্তি নবার লিয়াকত আলী খান। পাকিস্তানের সামনে তখনশাসনতন্ত্র রচনার সমস্যাসহ বহু জটিল সমস্যা। সে জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন ছিল পাকিস্তানের সব্ব-এলাকায় গ্রহণযোগ্য বলিষ্ঠ,সৎ এবং যোগ্য নেতৃত্ব।কায়েদে আযমের মৃত্যুর পরতেমন নেতৃত্বের অবসান ঘটে,তাঁর শূণ্যস্থান পূরণের মত সমমানের কোন নেতা সে সময় সমগ্র পাকিস্তানে ছিল না। গান্ধির জন্ম না হলেও ভারত নিশ্চিত স্বাধীন হতো, কিন্তু কায়েদে আয়ম না হলে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়তো আদৌ হত না। তাঁর মৃত্যুতে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে দেশটির বেঁচে থাকাতেও। জিন্নাহর মৃত্যুর পর পারস্পারীকএকতা ও বিশ্বাসের সে রাজনীতি আর অটুট থাকেনি। পাকিস্তানীরা দারুন ভাবে ব্যর্থ হয় জিন্নাহর মত সব্ব-পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় দ্বিতীয় একজন নেতার জন্ম দিতে। একটি দেশ বিজ্ঞানী, ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার বা কবি-সাহিত্যিক জন্ম দিতে না পারলেও হয়তো বেঁচে থাকে,কিন্তু বিপর্যয় ঘটে যোগ্য নেতা জন্ম

না দিলে।পাকিস্তানের রাজনীতিতে এটিই সবচেয়ে বড় ব্র্যথতা।জিন্নাহর মৃত্যুর পর বাঁকি নেতাদের সবচেয়ে বড় দৈন্যতাটি হলো,তাদের পরিচিত ও রাজনীতি ছিল তাদের নিজ নিজ প্রদেশে সীমিত। নিজ নিজ ভাষা, গোত্র এবং ক্ষুদ্র ভূগোলের উর্দ্ধে উঠার সার্মথ যেমন ছিল না, তেমন একটি ইচ্ছাও তাদের ছিল না। বরং নিজেদের প্রদেশভিত্তিক নেতৃত্বকে মজবুত করতে গিয়ে তারা অখণ্ডপাকিস্তানের কল্যাণ ভূলে নিজ নিজ এলাকার স্বাঁথকে অধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করেন,ফলে দ্রুত বেড়ে উঠে আঞ্চলিকতা এবং শুরু হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যের সাথে বেঈমানী।শুরু হয় অনৈক্য ও অবিশ্বাসের রাজনীতি। পাকিস্তানের ধ্বংসে যে কোন বিদেশী শত্রুর চেয়ে তাদের নিজেদের ভূমিকাই তখন বেশী বিধ্বংসী রূপ নেয়।

এসব আঞ্চলিক নেতাদের রাজনীতি এতটাই নিজ নিজ এলাকায় বন্দী হয়ে পড়েছিল যে,১৯৭০এর নির্বাচনে শেখ মুজিব এবং জুলফিকার আলী ভূট্টোরমত প্রধান নেতাগণ নিজ নিজ প্রদেশের বাইরে অন্য প্রদেশে নির্বাচনী প্রচারনায় নামার প্রয়োজনও তারা বোধ করেনি।সর্ব্ব-পাকিস্তানী নেতা রূপে আর্বিভাবের কোন আগ্রহও তাদের মধ্যে জাগেনি। ১৯৭১ এসে তাদের মাঝে পারস্পারীক অবিশ্বাস এতটাই চরম পর্য্যায়ে পৌছেছিল যে,এক নেতা অপর নেতার সাথে আলোচনায় বসা দূরে থাক,মুখ পর্য্যন্ত দেখতে চাইনি। তারই এক র্বণনা দিয়েছেন মাকিন গবেষক এবং প্রফেসর রির্চাড সিশন এবং প্রফেসর লিও রোজ তাঁদের বইতে।এ দুই মাকিন প্রফেসর একাত্তরের যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের সৃষ্টি নিয়েএকটি গবেষণার্ধমী বই লিখেছেন।বইয়ের নাম "War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh"। তথ্য সংগ্রহে তাঁরা দুইজন পাকিস্তান,ভারত ও বাংলাদেশের উচ্চপর্য্যায়ের সেসব ব্যক্তিদের সাথে দেখা করেছেন যারা ছিলেন সে সময়ের রাজনীতির মূল নিয়ন্ত্রক। সাক্ষাতদাতাদের মধ্যে ছিলেন সাবেক প্রেসডেন্ট ইয়াহিয়া খান,লে.জেনারেল নিয়াজী,এয়ার মার্শাল নূর খান,লে.জেনারেল হামিদ খান,লে.জেনারেল পীরজাদা,লে.জেনারেল সাহেবযাদা ইয়াকুব খান,এডমিরাল আহসান,মেজর জেনারেল রাও ফারমান আলী,অধ্যাপক গোলাম মাওলা চৌধুরি,একে ব্রোহী,মিয়া মমতাজ দৌওলাতানা,মমতাজ ভূট্টো,ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি,লে.জেনারেল অরোরা,ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম,পূর্ব্ব পাকিস্তান বিষয়ক ভারতীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কে.সি পান্ত,পশ্চিম পাকিস্তান বিষয়ক প্রতিমন্ত্রি রাম নিবাস র্মিধা, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আমলা পি.এন.হাকছার,পি.এন.ধর এবংবাংলাদেশের জেনারেল ওসামানি,ড.কামাল হোসেন,প্রশাসনিক আমলা শফিউল আযম,র্অথনীতিবিদ রেহমান সোবহানসহবহু ব্যক্তি।এ বইতে বেরিয়ে এসেছে ইতিহাসের বহু অজানা কথা।

আলোচনায় অনীহা

রাজনীতিমানব ইতিহাসের অতি উচ্চাঙ্গের র্আট বা শিল্প। ইসলামে এটি পবিত্র ইবাদত। রাজনৈতিক নেতার আসনে বসেছেন খোদ রাসূরুল্লাহ (সাঃ),বসেছেন মহান সাহাবীগণ। কিন্তু ভয়ানক বিপর্য্যয় দেখা দেয় যখন সেটি ইয়াজিদ বা মীরজাফরদের মত দুর্বৃত্তদের হাতে সেটি অধিকৃত হয়। রাজনীতির মূল কথা,মানুষের মাঝে সংযোগ,সমঝোতা ও একতা গড়া। রাজনীতির এটাই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশীলতা। এমন সৃষ্টিশীল রাজনীতির মধ্য দিয়ে একটি জাতি উচ্চতর সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার জন্ম দেয়। এমন রাজনীতির পিছনে থাকে জনকল্যানর্ধমী একটি র্দশন ও চেতনা। যখন কোন সমাজে সুস্থ্য রাজনীতি থাকে না তখন সে সমাজে রক্তাত্ব বিভক্তি ও সংঘাত দেখা দেয়। দেশ তখন নানা গোত্র,নানা র্বণ ও নানা ভাষাভাষিতে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। রাজনীতিতে এমন বিভক্তি এবং সংঘাতের কারণে উচ্চতর সভ্যতা দূরে থাক শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের

নানা ভাষা ও নানা অঞ্চলে বিভক্ত মুসলমানেরা ১৯৪৭ সালে বিশ্বের সর্ব্ব বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রটির জন্ম দিয়েছিল সে সৃজনশীল রাজনীতির কারণে। তাদের চেতনায় তখন বিশ্বমাঝে আবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর প্রবল আগ্রহ ছিল। কিন্তু সে রাজনীতি তার সুস্থ্য সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলে স্বার্থপর নেতাদের কারণে। রাজনীতিকে সৃজনশীল করতে হলে নেতাদের মাঝে যে গুণটি অতিশয় গুরুত্বর্পূণ তা হলো দেশ নিয়েনিঃস্বার্থ ভাবনা,আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার সার্মথ। তাদের প্রধান কাজটি মূলত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ভূলে নানা ভাষা,নানা অঞ্চল ও নানা বর্ণে বিভক্ত মানুষের মাঝে একতা গড়া। উদ্ধত গলাবাজী বা বক্তৃতার সার্মথ একজন দুর্বৃত্ত প্রতারকেরও থাকে।বরং এমন বক্তৃতাকে তারা প্রতিষ্ঠা লাভের বড় হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে। কিন্তুরাজনৈতিক নেতাদের যোগ্যতার প্রকৃত বিচার হয়দেশবাসীর মাঝে ভাতৃত্ব এবং ঘোরতর প্রতিদ্বন্দীর সাথেও সমঝোতা স্থাপনের সার্মথ দেখে। রাজনৈতিক নেতাগণ আবিস্কারক হবেন,ভালো ব্যবসায়ী বা দার্শনিক হবেন সেটি আশা করা যায় না। তবে এটুকু অবশ্যই আশা করা হয়,রাষ্ট্রের অন্যান্য শরিকদের সাথে ভদ্র এবং শান্তভাবে গঠনমূলক আলোচনার সার্মথ থাকবে। তারা যেমন রাজনৈতিক ময়দানের অন্যান্য খেলোয়াড়দের সাথে একত্রে বসবে,তেমনিবিভিন্ন জটিল বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি আপোষরফায়ওপৌঁছবে। একমাত্র এ পথেই একটি দেশের জনগণ ভয়ানক রক্তক্ষয় থেকে বাঁচে। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ যোগ্যতার বলেই পাকিস্তান স্থাপনে সফল হয়েছিলেন। তিনি যেমন গান্ধির সাথে আলোচনায় বসেছেন,তেমনি বসেছেনমাউন্টব্যাটেনের সাথেও।ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের সাথে আলোচনা করার লক্ষেসে সময় জিন্নাহ,ইকবাল,মহম্মদ আলী জওহর ও গান্ধির ন্যায় ভারতের স্বাধীনতাকামী নেতাগণ সাতসমূদ্র পাড়ি দিয়ে সূদুর লণ্ডনে গিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এ বৈঠকগুলো গোল টেবিল বৈঠক রূপে পরিচিত।

কিন্তু আলোচনার বৈঠকে বসাররুচীযেমন মুজিবের ছিল না,তেমনি ভূট্টোরও ছিল না। পাকিস্তানের যখন ভয়ানক দুর্দিন সে মুর্হুতটিতেও শেখ মুজিব এবং জূলফিকার আলী ভূট্টো একত্রে বসতে রাজী হননি। মুজিব যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে রাজী হননি, ভূট্টোও তেমনি পূর্ব্ব পাকিস্তানে আসতে রাজী হয়নি। শেখ মুজিব দেশের প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনায়ও তেমন আগ্রহ দেখাননি। নিতান্তই চাপের মুখে যখন আলোচনায় বসেছেন তখন ভদ্রভাবে একে অপরের সাথে কথা বলতেও রাজী হননি। নিজেদের রচিত বইতে তাদের সে অনাগ্রহটি তুলে ধরেছেন প্রফেসর রির্চাড সিশন এবং প্রফেসর লিও রোজ। ১৯৭১এর ফেব্রেয়ারির শুরুর দিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মুজিবের সাথে সাক্ষাতের জন্য ইসলামাবাদে যাওয়ার জন্য দাওয়াত করেন। কিন্তু মুজিব সেখানে যেতে অস্বীকার করেন।পাকিস্তানের ৫টি প্রদেশের ৪টি পশ্চিম পাকিস্তানে,ফলে সেখানে গেলে পাকিস্তানের জাতীয় নেতা রূপে তার ভাবমুতি বাড়ার সম্ভাবনা ছিল। সরকার গঠনে তিনি হয়তো ন্যাপ নেতা ওয়ালী খান,জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নেতা মূফতি মাহমুদ,কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা পাঞ্জাবেরমমতাজর দৌলতানার সর্মথন হয়তো পেতেন। কিন্তু তা নিয়ে তাঁর কোন আগ্রহই ছিল না। শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাতের গুরুত্ব তুলে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন পূর্ব্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গর্ভনর এ্যাডমিরাল আহসান। শেখ মুজিব এরপরও তেমন বৈঠকে রাজী হননি। মুজিবের অহংকার,তিনি পূর্ব্ব পাকিস্তানের নিরুংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা। তাঁর কথা, তাঁর সাথে দেখা করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বরং ঢাকায় আসতে হবে।

শুরু থেকেই শেখ মুজিবের মনে শুধু যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপর অবিশ্বাস ছিল তা নয়, অবিশ্বাস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতাদের উপরও। মুজিবের ধারণা ছিল, প্রেসিডেন্টইয়াহিয়া জনাব ভুট্টোকে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন। জনাব ভূট্টোশেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে আগ্রহী ছিলেন। ইয়াহিয়া খানও চাচ্ছিলেন একটি জাতীয় সরকার গঠিত হোক। শেখ মুজিবের যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে

ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর কোন সদস্যই ছিল না, আওয়ামী লীগের একক সরকার গঠিত হলে সেটি পশ্চিম পাকিস্তানের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীর শাসন রূপে চিত্রিত হতো। ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে কোন সময়েই কেন্দ্রে কোন একক প্রদেশের লোক নিয়ে সরকার গঠিত হয়নি। পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে যদি কেউ প্রধানমন্ত্রী হয় তবে গর্ভনর জেনারেল তথা প্রেসিডেন্ট হয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, এ দাবীতে কেন্দ্রে শুধু এ দলটি নিয়ে কোন একক দলীয় সরকার গঠিত হলে সেটি গণতান্ত্রিক ভাবে সিদ্ধ হলেও নৈতিক ভাবে সিদ্ধ হতো না। পাকিস্তান বাংলাদেশের ন্যায় একটি মাত্র প্রদেশ ভিত্তিক কোন দেশ নয়। সে সময় পাকিস্তানে ছিল ৫টি প্রদেশ। তাই দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলকে শুধু একটি মাত্র প্রদেশে জনপ্রিয় হলে চলে না,অন্যান্য প্রদেশের জনগণকেও সাথে নেয়ার দায়িত্বটিও তাকে বহন করতে হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগের সে সার্মথ যেমন ছিল না,সে আগ্রহও ছিল না। ১৯৭০এর নির্ব্বাচনে দলটি জিতেছিল একটি মাত্র প্রদেশ থেকে। ফলে সমগ্র পাকিস্তানে দলটির কোনর গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। যে কোন গণতান্ত্রিক দেশে এমন অবস্থায় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়।অথচ আওয়ামী লীগের জিদ ছিল,যেহেতু পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল,অতএব শাসনতন্ত্র রচনা এবং দেশ শাসনের একক অধিকার একমাত্র তাদের। তাদের দাবী,অন্যদের উচিত তাদের শাসন এবং তাদের রচিত শাসনতন্ত্র বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়া। গণতন্ত্র বলতে তারা এটাকেই বুঝাতো। এ বিষয়ে শেখ মুজিব কোনরূপ আপোষরফায় রাজী ছিলেন না। অথচ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া চাচ্ছিলেন,ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে দুই প্রদেশের নেতাদের সাথে একটা সমঝোতা হোক।আর সে সমঝোতা না হওয়ায় ইয়াহিয়া খানকে জাতীয় পরিষদের বৈঠককে মুলতবি করতে হয়েছিল। কিন্তু সে মুলতবির পর শুরু হয় চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংকট। সে সময় ভূট্টোকে ক্যাবিনেটে অংশ দেয়ার বিরুদ্ধে মুজিবের যুক্তি ছিল,ভূট্টো হলো একটি ট্রজান হর্স। অপরদিকে ভূট্টোর অবিশ্বাসও কমছিল না।তার র্দুভাবনা ছিল,আর্মি হয়তো তাকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখবে। তাই আর্মির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করতে তিনি মুজিবকে বলেছিলেন,আর্মি কখনই বাঙালীর হাতে ক্ষমতা দিবে না।চশেখ মুজিবও চেষ্টা করেছেন আর্মির বিরুদ্ধে জনাব ভূট্টোকে খ্যাপাতে। শেখ মুজিব তাই ভূট্টোকে বলেছিলেনআর্মিকে বিশ্বাস না করতে। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে হুশিয়ার করে দিয়ে শেখ মুজিব ভূট্টোকে বলেছিলে সেনাবাহিনা আমাকে ধ্বংস করতে পারলে আপনাকেও ধরবে।চ –(Sisson and Rose, 1990)। এই হলো সে সময়কার নেতাদের পারস্পারিক অবিশ্বাসের নমুনা।

বাঙালী শাসনের ভয়

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি ছিল প্যান–ইসলামী চেতনা। ভাষাভিত্তিক জাতিয়তার স্থান এ আন্দোলনে ছিল না। তখন ভাষা ও প্রদেশভিত্তিক বিভিক্তকে মুসলমানদের জন্য আত্মবিনাশী এবং ইসলাম বিরোধী রূপে চিত্রিত করা হতো। বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত হিন্দুরাও সেদিন এক হিন্দুস্থানী জাতীয়তার ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীরা ভাসতে শুরু করে বাঙালী জাতীয়তাবাদের জোয়ারে। ফলে দেশটির জন্য দ্রুত দূর্দিনও ঘনিয়ে আসতে শুরু করে। এমন ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতিয়তাবাদের প্রথম শুরু হয় ১৯০৫ সালে যখন তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে বিভক্ত করে এবং পূর্ব্ব বাংলা ও আসামকে নিয়ে আলাদা প্রদেশ গড়ে। এ আন্দোলনের নেতার্কমীরা ছিল মূলত হিন্দু। বাংলার বিভক্তিতে হিন্দুদের র্স্বাথহানি হবে সে বিশ্বাস নিয়েই তারা বাঙালী জাতীয়তার শ্লোগান নিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু করেছিল, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরওসে আন্দোলনে মাঠে নেমেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তিনি গান ও কবিতা লিখেছেন। অবশেষে ১৯১১সালে ব্রিটিশ সরকারকে তারাবঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য করে। কিন্তু

হিন্দুরাই আবার সে বাঙালী জাতিয়তাবাদ পরিত্যাগ করে ১৯৪৭ সালে। তখন ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতিয়তাবাদ র্বজন করে তারা হিন্দু র্ধমভিত্তিক হিন্দুস্থানী জাতিয়তাকে গুরুত্ব দেয় এবং র্ধমের ভিত্তিতেবাংলাকে খণ্ডিত করাকে তারা অনিবার্য করে তোলে। তখন পূর্ব্ব বাংলার বাঙালীদের পরিত্যাগ করে তারা অবাঙালী হিন্দুদের সাথে ভারতে যোগ দেয়। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাঙালী জাতীয়তাবাদের সে পতাকা তুলে নেয় বাঙালী মুসলমানেরা এবং সেটি প্রবল আকার ধারণ করে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের পর। সে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে যখন তৎকালীন পাকিস্তান সরকার র্উদুকে রাষ্ট ভাষা করার ঘোষণা দেয়। তৎকালীন সরকার র্উদুকে রাষ্টভাষার ঘোষণা দিয়েছিল পাকিস্তানের সংহতি মজবুত করার লক্ষ্যে, বাংলা ভাষাকে বিলুপ্ত করার জন্য নয়। বাংলা ভাষা সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানীর ভাষা হলেও সেটির র্চচা বাংলার বাইরে ছিল না। একই অবস্থা ছিল পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পশতু এ বেলুচ ভাষার। অথচ র্উদু ভাষা পাকিস্তানের প্রতি প্রদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমানেরা বুঝতেো। সকল প্রদেশের সবগুলো মাদ্রাসাতেই এভাষাতে শিক্ষা দেয়া হত। সে সময় একমাত্র ঢাকা শহরে যত র্উদু ভাষী ছিল এবং এ ভাষায় যত বই ছাপা হত পূর্ব্ব পাকিস্তানের বাইরে সমগ্র পাকিস্তানে ততজন বাংলাভাষী ছিল না এবং বাংলার র্চচাও ছিল না। কিন্তু নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাঙালীরা তখন সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠার দাবী তোলে।

১৯৪৭এর পূর্ব্বে ভারতের মুসলমানদের মনে প্রচণ্ড ভয় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু শাসনের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে তখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছে। আর গণতন্ত্রের মূল কথা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। সাব্বভৌমত্ব বলতে বুঝায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সাব্বভৌমত্ব। সংখ্যালঘিষ্টদের দাবী যত যৌক্তিকই হোক সেটি মেনে নেয়ায় গণতন্ত্রে কোন বাধ্যবাধকতানেই।ফলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা -তা যত অযৌক্তিক এবং অমানবিকই হোক,সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে সেটির প্রতিষ্ঠাইযে সাংবিধানিক বৈধতা পাবে সে ভয় ছিল ভারতীয় মুসলমানদের মনে। তাদের সে ভয় যে আদৌ অমূলক ছিল না,বরং অতি সঠিক ছিল তার বড় প্রমাণ আজকের ভারত। মুখে সেক্যুলারিজমের কথা বললেও ভারতীয় নেতাগণ ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথে হিন্দুর্ধমের পৌরাণিক বিশ্বাস,র্দশন ও মুর্তিকে জাতীয় মর‍্যাদা দেয়। মুসলমানদের বাধ্য করা হয়ঈমানের সাথে সাংঘষিক জাতীয় সঙ্গিত গাইতে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুনেতাদের কাছে কাছে গুরুত্ব পায়নিবাবরী মসজিদের ন্যায় মসজিদের নিরাপত্তা দানের বিষয়টি। শিক্ষাদীক্ষা ও চাকুরিতে মুসলমানদের উন্নয়ন দূরে থাক, তাদের কাছে গুরুত্ব পায়নি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে মুসলমানদের জানমাল ও ইজ্জত-আবরু বাঁচানোর ন্যায় অতি মৌলিক মানবিক বিষয়গুলিও। একই কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের বিরুদ্ধে ভয় দানা বাঁধতে থাকে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশবাসীদের মনে। আর সে ভয়ই তীব্রতর হয় ভাষা আন্দোলনের পর। সে ভয় আরো তীব্রতর হয় ১৯৭০এর নির্ব্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় এবং বিজয় শেষে শাসনতন্ত্র রচনায় ও সরকার গঠনে শেখ মুজিবের আপোষহীন মনভাবের কারণে।পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই দাবী উঠে সমগ্র পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠার দাবী। অথচ পাঞ্জাবী,সিন্ধু, পাঠান, বেলূচ এবং ভারত থেকে আগত গুজরাতি, রাজস্থানী, বিহারী, মারাঠী ইত্যাদী ভাষাভাষীদের কারোই মাতৃভাষা র্উদু ছিল না। কিন্তু মাতৃভাষা না হলেও র্উদূ র্বণমালা ও সাহিত্যের সাথে তাদের পুরনো পরিচিত ছিল। কিন্তু সে অবস্থান বাংলা ভাষার ছিল না।

সেনাবাহিনীর দুশ্চিন্তা

সত্তরের নির্ব্বাচন কালে পাকিস্তান আর্মির দুটো মৌলিক বিষয় নিয়েপ্রচণ্ড দুশ্চিন্তা ছিল -যারনিষ্পত্তি তারা সে নির্ব্বাচনের যারা বিজয়ী হয়েছিল তাদের কাছ থেকে আশা করছিল। তা ছিল, এক. পাকিস্তানের সংহতি, দুই. পাকিস্তান আর্মির বাজেট,সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রমোশন, পোষ্টিং ও লজিস্টিক নিয়ে আর্মির স্বাধীনতার

বিষয়। এ দুটি বিষয়ের বাইরে প্রদেশগুলির স্বায়ত্বশাসনের বিষয়ে ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর সহকর্মিরা ছিল পূর্ব্বর্তি সরকারগুলোর তুলনায় অনেক বেশী উদার। ফলে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসেই পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙে দেন এবং পুনরায় পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্তপ্রদেশ এবং বেলুচিস্তান এ চারটি প্রদেশের জন্ম দেন।অথচ এ চারটি প্রদেশ ভেঙ্গে এক পশ্চিম পাকিস্তান গড়া হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ট পূর্ব্ব পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে অবাঙালীদের একতাবদ্ধ শক্তি রূপে খাড়া করার জন্য। ইয়হিয়া খান এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে পূর্ব্ব পাকিস্তানর জন্য জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনর্নিধারিত করেন। ইয়াহিয়া খানের এরূপ সিদ্ধান্তের কারণে শেখ মুজিবও তাঁর উপর এতটাই খুশি ছিলেন যে এমন কি তাঁকেনাকি শাসনতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাবও দেন। তবে সে প্রস্তাব পেশে নির্ব্বাচনে ইয়াহিয়া খান ও তাঁর সেনাবাহিনীর সুনজর ও সহযোগিতা লাভের বিষয়টিই সম্ভবতঃ বেশী ছিল। আওয়ামী লীগ যে সে সহযোগিতা পেয়েছিল সে প্রমাণও প্রচুর।

ক্ষমতাসীন আমিরর্ব্যথ অনেক। তবে সবচেয়ে বড় র্ব্যথতা রাজনীতির জটিল বিষয়ের অনুধাবনে। এমনকি পূর্ব্বর্বতী সিভিল সরকারগুলোরবহু কষ্টে অর্জিত র্অজনসমূহর গুরুত্ব বুঝতেও তারা র্ব্যথ হয়। ফলে সমাধানকৃত জটিল বিষয়কে তারা আবার বির্তকিত করে। বহু দেনবার ও আপোষরফারপর ১৯৫৬ সালে যে শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছিল সেটি তাদের কাছে কোন গুরুত্বই পায়নি। অথচ সেটি ছিল র্পালামেন্টারী প্রথার গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার শাসনতন্ত্র। এটি ছিল পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। আইয়ুব খান সেটিকে বেআইনী ভাবে বিলুপ্ত করেছিল,আর জেনারেল ইয়াহিয়া খান শাসনতন্ত্র বিলুপ্তি করণকেই জায়েজ রূপে বহাল রাখেন। অবশেষে সে শাসনতান্ত্রিক জটিলতাই দেশটির বিনাশের কারণ হয়।

তবে ১৯৭০এর নির্ব্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের রাজনীতির চিত্রই পাল্টে দেয়। এ নির্ব্বাচন শুধু সরকারকেইহতবাক করেনি, হতবাক করেছিল শেখ মুজিব এবং জনাব ভূট্টোকেও। শেখ মুজিব এবং জুলফিকার আলী ভূট্টো এ দুজনের কেউই ভাবতে পারিনি তারা এত বিপুল আসনে নির্ব্বাচিত হবে। নির্ব্বাচনের আগে ভূট্টোর অবস্থা এমন ছিল যে,জনাবমমতাজ দৌলতানার কাউন্সিল মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে পাঞ্জাবে তার দলকে মাত্র ২০টি সিট ছেড়ে দিলে তিনি তাঁর সাথে আপোষ করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু দৌলতানা ভেবেছিলেন,ভূট্টোর দল পাঞ্জাবে ২০সিটেও নির্ব্বাচনী লড়াই পরিচালনার র্অথ জোগাতে পারবে না। ফলে তিনি ২০ সিঠ দিতেও রাজী হননি। কিন্তু শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে ভূট্টোরও।পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা ভূট্টোকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী শাসনের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিদ্বন্দি মনে করে এবং মুসলিম লীগের প্রবীন নেতাদের বদলে তাঁকে র্অথ জোগায়। ফলে নির্ব্বাচনে দৌলাতানাদের অনুমান ভূল প্রমানিত হয়।-(Sisson and Rose, 1990)।

ভূট্টোর ক্ষমতালিপ্সা

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৯৭০ সালের ১২ জানুয়ারি তিন দিনের জন্য ঢাকার আসেন এবং শেখ মুজিবের সাথ দুই বার দেখা করেন। একবার ছিল ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত বৈঠক। দ্বিতীয় বৈঠকটি ছিল তিন ঘন্টার। সে বৈঠকে আওয়ামী লীগের হাই কমাণ্ড উপস্থিত ছিল। ইয়াহিয়া খানের সাথে ছিল তাঁর দুইজন সহকারি। ঢাকার অবস্থান শেষে যাওয়ার আগে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী রূপে ঘোষণা দেন এবং একথাও বলেন তার কাজ এখন শেষ এবং প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রস্থানের। অপর দিক নির্ব্বাচনে আশীতীত সাফল্যের পর ভূট্টোর ক্ষমতালিপ্সা এতটাই প্রচণ্ড ছিল যে, ইয়াহিয়া খানকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, আমি অপেক্ষা করতে পারবো না,এখনই ক্ষমতা চাই। তিনি এ আভাসও দেন, পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেয়াই তার

অদিষ্ট এবং সেকাজে কোন রূপ বিলম্ব হতে দিতে রাজী নয়। সরকারের এক উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে জানিয়ে দিয়েছিলেন,একবছরের মধ্যে গদী না পেলে ভূট্টো বদ্ধ পাগল হয়ে যাবে। মার্চের দিকে ভূট্টো অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ও সংঘাতমুখি হয়ে পড়ে। জাতীয় পরিষদে তার পার্টি একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ পার্টি রূপে আর্বিভূত হলেও তিনি পিপলস পার্টিকে দুই মেজোরিটি পার্টির একটি রূপে দাবী করেন। শেখ মুজিবের সাথে জানুয়ারির সাক্ষাতে মুজিবকে কেন পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তাতে তিনি ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ছিলেন। –(Sisson and Rose, 1990)। জনাব ভূট্টো একথাও বলেন,আওয়ামী লীগ শুধু একমাত্র প্রদেশের দল,অতএব কি করে সে দল সমগ্র পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কথা বলার অধিকার রাখে? তার দাবী,পিপলস পার্টি পাঞ্জাব ও সিন্ধু এ দুটি প্রদেশ থেকে নির্বাচিত হয়েছে। অতএব যে কোন সরকার গঠনে অবশ্যই পিপলস পার্টির অংশদারিত্ব থাকতে হবে। অপরদিকে মুজিবের দাবী ছিল,নির্বাচন ছিল ৬দফার উপর রিফারেণ্ডাম,বিশ্বের কোন শক্তি ৬ দফার বাস্তবায়ন রুখতে পারবে না। সরকার প্রতিষ্ঠায় তিনি জনাব ভূট্টো থেকে কোনরূপ সহযোগিতা নিতে আগ্রহী ছিলেন না। মুজিব তাঁর সাথে সরকার গঠন নিয়েওকোন রূপ আলাচনায় বসতে রাজী হননি।

অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলিতে শেখ মুজিব এবং জনাব ভূট্টোর মধ্যে কোন রূপ যোগাযোগোই ছিল না। এমনকি তাদের মধ্যে সৌজন্যমূলক আচরণও লোপ পেয়েছিল। এবং সে বিবরণটিও দিয়েছেন Sisson and Rose। ইয়াহিয়া খান ১৫ই মার্চ ঢাকায় আসেন। পরের দিন তিনি প্রেসিডেন্ট হাউসে শেখ মুজিবকে আলোচনায় ডাকেন,এবং একটি শান্তির্পূণ আলাপ আলোচনার গুরুত্বটি তুলে ধরেন। ১৯ মার্চ শেখ মুজিব জানান তিনি ভূট্টোর সাথে আলোচনায় বসতে রাজী আছেন। সে খবর ভূট্টোকে জানানোর পর ২১ মার্চ ঢাকায় আসেন। ঢাকার পরিস্থিতি তখন খুবই থম থমে। সেনা-পাহারায় তাঁকে বিমান বন্দর থেকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আনা। হোটেলের বাঙালী স্টাফগণ তাঁর সাথে কথা বলতে এবং কোনরূপ আপ্যায়ন করতে অস্বীকৃতি জানায়। এ ছিল এক অদ্ভুদ অবস্থা। ভূট্টো ও তাঁর দলের নেতাদের হোটেলের সর্ব্বোচ্চ তালায় নেয়া হয়। অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অবশেষে ২২ মার্চ প্রেসিডেন্ট ভবনে বৈঠক বসে। আলোচনা কক্ষে বসে শেখ মুজিব ও জনাব ভূট্টো একেঅপরের দিকে সরাসরি না তাকিয়ে চেয়ারে আধাআধি ঘুরে বসে থাকেন। শেখ মুজিবের ঘোরতর আপত্তি,কেন ভূট্টোকে ডাকা হয়েছে। অপরদিকে ভূট্টোর অভিযোগ,শেখ মুজিব যখন তাঁর সাথে আলোচনায় বসতে রাজী নয় তবেকেন তাকে ঢাকায় ডেকে আনা হলো?উভয়ের অভিযোগ ও অবিশ্বাস ইয়াহিয়া খানের উপর।আলোচনায় অচলাবস্থা দেখে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিব এবং জনাব ভূট্টোর হাত ধরে একে অপরের কাছে টানেন এবং সামাজিক সৌজন্য ও ভদ্রতার বিষয়টিও স্মরণ করিয়ে দেন। তাতে আলোচনা কিছুটা শুরু হলেও সেটি কোন রূপ আপোষ-রফার জন্য উপযোগী ছিল না। অবশেষে ভূট্টো ও মুজিব উভয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে বারান্দায় পায়াচারি শুরু করেন। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব ভূট্টোকে সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করার ব্যাপার হুশিয়ার করে দেন। অপরদিকে ভূট্টো শেখ মুজিবের আর্মির উপর অবিশ্বাসকে আরো তীব্রতর করেন,আর্মির সাথে সমাঝোতা যে তার জন্য বোকামী হবে সেটিও তাকে বলেন।-(Sisson and Rose, 1990)।

প্রেসিডেন্ট ভবনে স্বাধীনতার পতাকা নিয়ে মুজিব

আলোচনা গুরুত্বর্পূণ মোড় নেয় মূলত ২৩ মার্চ। ঐদিনটি পাকিস্তানের ইতিহাসে অতি গুরুত্বর্পূণ। পাকিস্তানের ইতিহাসে ঐ দিনটি পরিচিত পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রি দিবস রূপে। ১৯৪০ সালের ঐদিনে লাহোরের মিন্টো পার্কে মুসলিম লীগের সন্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাব পেশ করেছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক।ঐদিন পাকিস্তানে সরকারি ভবনগুলোতে পাকিস্তানের চাঁদতারা খচিত সবুজ পতাকা উত্তোলনের

দিন।আওয়ামী লীগ ঐদিনকে প্রতিরোধ দিবস রূপে ঘোষণা দেয়।ঐদিন ঢাকায় বিপুল ভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়,এবং নানা স্থানে পদদলিত করা হয় পাকিস্তানের পতাকাকে। পাকিস্তানের পতাকা সেদিন শুধুমাত্র সামরিক স্থাপনাগুলিতেই উড়তে দেখা যায়। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ঐদিন স্বাধীনতা ও সামরিক প্রতিরোধের ঘোষণা দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের হাজারহাজার র্কমী প্যারেড,কুচকাওয়াজ ও মিছিল করে।রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র তখন ঢাকা রেডিওচ নামে নিজস্ব সম্প্রচার চালাতে থাকে। ঐদিনের ঘটনাবলিতেপাকিস্তান আর্মির মধ্যেউদ্বেগ গুরুতর আকার ধারণ করে। সে উদ্বেগের অন্যতম কারণ,অবসরপ্রাপ্ত দুই বাঙালী অফিসার র্কনেল ওসমানি এবং মেজর জেনারেল মজিদ সামরিক বাহিনীর সাবেক সেনাদের নিয়ে ঢাকাতে এক সমাবেশ করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে তাদের এগিয়ে যেতে বলেন। সমাবেশ শেষে তারা মিছিল করে শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির বাসায় যান এবং তাঁর শুভেচ্ছা নেন।ঐদিন ছাত্রলীগ র্কমীদের নিয়ে গঠিত জয়বাংলা ব্রিগেড পল্টন ময়দানে এক সমাবেশ করে এবং ছাত্রলীগের চার নেতার নেতৃত্বে শেখ মুজিবের বাসায় গিয়ে তার থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করে। পাকিস্তান আর্মির জন্য অবস্থা চুড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌছে যখন শেখ মুজিব নিজে তাঁর নিজের গাড়ীতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে ইয়াহিয়া খানের সাথে বৈঠক করতে প্রেসিডেন্ট ভবনে আসেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে এতদিনও যারা একটি আপোষরফা নিয়ে আশাবাদী ছিলেন তাদের কাছে শেখ মুজিবের এ আচরণ অতি অপমানজনক মনে হয়েছিল। সেটি অতিশয় বিদ্রুপ ছিল পাকিস্তানের প্রতিও। অপরদিকে আলোচনা এমন এক পর্য্যায়ে পৌছেছিল যে, ইয়াহিয়া খান এবং ভূট্টো উভয়ই শেখ মুজিবের ৬ দফা মেনে নেন। তারা আওয়ামী লীগের এ দাবীও মেনে নেন যে পূর্ব্ব পাকিস্তানে একটি পৃথক রির্জাভ ব্যাংক থাকবে এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মূদ্রা গচ্ছিত রাখার জন্য একটি পৃথক ফাণ্ডও থাকবে। ভূট্টোর দলও এসব নিয়ে আর কোন আপত্তি তোলেনি। ইয়াহিয়া খান তখন তার র্অথনৈতিক উপদেষ্টা এম.এম আহম্মদকে নির্দেশ দেন ৬ দফার ভিত্তিতে র্অথনীতিকে সাজানোর খসড়া প্রণয়নে। সরকার এসব নিয়ে একটি মেমোরেণ্ডাম অফ আন্ডারস্টডিং স্বাক্ষরেরও প্রস্তুতি নিচ্ছিল। -(Sisson and Rose, 1990)।সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনা শুরু হয় কিভাবে কেন্দ্রে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় তা নিয়ে। ইয়াহিয়া খান চাচ্ছিলেন,শেখ মুজিবকে প্রধানন্ত্রী করে সত্ত্বর একটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হোক। সে কোয়ালিশনে ভূট্টো বা পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যদলের সদস্যরাও থাকবে এবং সত্ত্বর একটি শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শুরু করবে।

পাল্টিয়ে গেল গোলপোষ্ট

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং জনাব ভূট্টো আওয়ামী লীগের ৬ দফা পুরোপুরি মেনে নিলেও আলোচনা ধেয়ে চলে চরম র্ব্যথতার দিকে। আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যে তার গোলপোষ্টই পাল্টিয়ে ফেলে। শেখ মুজিব তখন নিজেই তাঁর ৬ দফার কথা ভূলে যান। তিনি ইয়াহিয়া এবং জনাব ভূট্টোর কাছে এমন সব নতুন নতুন দফা পেশ করেন যা তিনি পূর্ব্বে কখনই জনসম্মুখে বলেননি, নির্ব্বাচনী মেনিফেস্টোতে ঘোষণা দেননি এবং জনগণের পক্ষ থেকে তার পক্ষে কোন ভোটও নেননি। তিনি তখন আর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ নিয়ে আগ্রহী ছিলেননা। বরং দাবী তুলেন দুই প্রদেশে দুইটি পৃথক "Constituent Conventions" গঠনের এবং সে সাথে সত্বর প্রাদেশিক পর্য্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের। আরো দাবী তোলেন,জাতীয় পরিষদের বৈঠক জাতীয় ভাবে বসবে না,সেটি বসবে প্রাদেশিক ভাবে এবং পৃথক পৃথক ভাবে। প্রাদেশিক ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সত্ত্বর সামরিক আইন তুলে নিতে হবে। ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল সংসদ সদস্যরা পাকিস্তানের অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতা-সার্ব্বভৌমত্ব সংরক্ষণের শপথ নিবে। শেখ মুজিব ও তাঁর দল তাতে রাজী হয়নি। বরং আওয়ামী লীগের দাবি ছিল,সংসদ সদস্যগণের অঙ্গিকার থাকবে স্রেফ শাসনতন্ত্রের প্রতি,পাকিস্তানের প্রতি নয়।

পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়,দেশের নাম হবে “Federation of Pakistan”কিন্ত আওয়ামী লীগের দাবী ছিল সেটি হবে“Confedaration of Pakistan”।সরকারি পক্ষ Confedaration এর বদলে ভারতীয় আদলে “Union” শব্দটি মেনে নিতে রাজী ছিল।কিন্তু শেখ মুজিবের জিদ ধরেন,কনফেডারেশনচ শব্দটিইরাখতে হবে। -(Sisson and Rose, 1990)।

সরকারি পক্ষের কথা ছিল,কনফেডারেশন হয় দুটি স্বাধীন দেশের মধ্যে,কখনই একই দেশের দুইটি প্রদেশের মধ্যে নয়। ইয়াহিয়া খান ও তাঁর টিমের কাছে শেখ মুজিবের এসব প্রস্তাব সাংবিধানিক ভাবে বিচ্ছিন্নতার ষড়যন্ত্র মনে হয়।তারা মনে বিশ্বাস জন্মে,মুজিবের দাবী মেনে নিয়ে সামরিক শাসন তুলে নেয়ার সাথে সাথেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে আর কোন বাধাই থাকবে না।তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আর কোন রূপ আইনগত ক্ষমতাই থাকবে না,এবং সে সাথে আইনগত বৈধতাও থাকবে না। কারণ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতার মূল উৎস ছিল সামরিক আইন।। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন না করে দুই প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে এবং সামরিক আইন তুলে নিলে শুধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াই ক্ষমতা হারাবেন না,সে সাথে অখণ্ড পাকিস্তানেরও আইনগত বিলুপ্ত ঘটবে। বিষয়টি এতই সুস্পষ্ট ছিল যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানই শুধু নয়,জনাব ভূট্টোও এরূপ দাবী মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। মানতে রাজী ছিলেন না ন্যাপের জনাব আব্দুল ওয়ালী খানসহ পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারাও। এ বিষয়ে জনাব ভূট্টো লিখেছেন,“Martial Law was the source of law then obtaining in Pakistan and the very basis of the President’s authority; and with the proclaimation lifting Martial Law, the President and the Central Government would have lost their legal authority and sanction. There would thus be a vacuum unless the National Assembly wascalled into being to establish a new source of sovereign power on the national level. If, in the absence of such national source, power were transferred as proposed in the provinces, the government of each province could acquire de facto and de jure sovereign status.”-(Bhutto, *Great Tragedy*, p.43)অর্থাৎ,তখন পাকিস্তানে আইনের উৎস ছিল সামরিক আইন,এবং এটাই ছিল প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার মূল ভিত্তি। ফলে সামরিক আইন তুলে নেয়ার ঘোষণার সাথে সাথে প্রেসিডেন্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকার তার আইনগত ক্ষমতা এবং অর্পিত অধিকারহারিয়ে ফেলতো। জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহবান করেজাতীয় পর্যায়ে সার্বভৌম ক্ষমতার নতুন উৎস প্রতিষ্ঠা না করলেক্ষমতার শূণ্যতা সৃষ্টি হতো। জাতীয় পর্যায়ে সার্বভৌম ক্ষমতার এমনশূণ্যতা নিয়ে প্রদেশগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে প্রত্যেকটি প্রদেশের সরকারই কার্যতঃ এবং আইনতঃ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারি হতো। অথচ শেখ মুজিব ও তার দল সেটিই চাচ্ছিলেন। জনাব ভূট্টোকে এটাকেই বলেছেন “constitutional secession”বা শাসনতন্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা।

২৩শে মার্চের রাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ছোট ছোট দলের নেতাদের সাথে মিলিত হন। তিনি তাদের কাছে শেখ মুজিবের আপোষহীন মনোভাবের কথা তুলে ধরেন। তাদেরকে একথাও বলেন, শেখ মুজিবের দাবীমেনে নিলে বিশ্ববাসী হাঁসবে এবং তাঁকে বোকা বলে উপহাস করবে। ২৪শে মার্চ ন্যাপ নেতা ওয়ালী খান এবং গাওস বকস বিজেঞ্জো শেখ মুজিবের সাথ দেখা করেন। তাঁরা তাকে দুই Constituent Conventions এবং Confedaration of Pakistan এর দাবী প্রত্যাহারের পরার্মশ দেন। কিন্তু তাদের সে প্রস্তাব শেখ মুজিব মানেন নি। শেষ আলোচনা হয় ২৪ তারিখে। তাজুদ্দীন আহমেদ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু তাতে আলোচনা আর সামনে এগুয়নি। এরপর অধিক আলোচনা চালিয়ে যাওয়া ইয়াহিয়া খানের কাছে অর্নথক মনে হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রচণ্ড আশাহত হন। তাঁর আশা ছিল,শেখ মুজিব পাকিস্তানকে

বাঁচানোর ব্যাপারে অন্ততঃ আন্তরিক হবেন। এমন একটি ধারণা শেখ মুজিবই ইয়াহিয়াকে দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবই তাঁকে বলেছিলেন,৬ দফা কোন বাইবেল নয়। শেখ মুজিবের সে কথাটিকে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করেছিলেন। ফলে পাকিস্তান মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সির গুপ্তচরেরা যখন মুজিবের পাকিস্তান বিধ্বংসী পরিকল্পনার ক্যাসেট শুনেয়েছিল তখনও তিনি সেটি বিশ্বাস করেননি। এমন ধোকা শুধু ইয়াহিয়াকে নয়,অনেককেই দিয়েছিলেন।বেশী দিয়েছিলেন তৎকালীন পূর্ব্ব পাকিস্তানের কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে। ধোকা দেয়ার চাতুর্য্য নিয়ে একটি উদাহরণ দেয়া যাক। দৈনিক ইনকিলাবের ফিচার সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল গফুরর বাড়ি বৃহত্তর ফরিদপুরের রাজবাড়ীতে। তিনি মুজিবের সাথে ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত ছিলেন। তমুদ্দন মজলিসের অফিসে অনুষ্ঠিত একবৈঠকে “যেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম,একবার বলছিলেন“একবার শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির বাসায় তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। বাসায় প্রবেশের পর দেয়ালে টানানো কিছু ফটো দেখছিলাম। হঠাৎ করে কে যেন পিছন দিক থেকে আমার চোখ চেপে ধরলো। বুঝলাম এ কাজ শেখ মুজিবের। চোখ ছাড়লে আমি তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম“আপনি কি সত্যই পাকিস্তান ভাঙ্গতে চান।চ মুজিব বললেন“তুইও কি তাই বিশ্বাস করিস? যে পাকিস্তান নিজ হাতে বানিয়েছি সেটি কি আমি ভাঙ্গতে পারি? অথচ এই সেই শেখ মুজিব পাকিস্তানের জেল থেকে ১৯৭২ সালে ফেরার পর ঢাকার সহরোয়ার্দি উদ্দানের জনসভায় বল্লেন“পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ সৃষ্টির কাজের শুরু একাত্তর থেকে নয়,১৯৪৭ সাল থেকে।চশেখ মুজিবের সে কথা অধ্যাপক গফুর বিশ্বাস করেছিলেন কি না জানি না। তবে শেখ মুজিবের এমন কথা বাংলার বহু মানুষই সেদিন বিশ্বাস করেছিল। এমন কথা হয়তো ইয়াহিয়া খানকেও বলেছিলেন,এবং সেটি তিনি বিশ্বাসও করেছিলেন। তবে ইয়াহিয়া খানের অপরাধ,তিনি শুধু শেখ মুজিবকে বিশ্বাসই করেননি,তাঁকে রাজপথের দখল ও অন্যান্য দলের নির্ব্বাচনি জনসভা গুলোকে পণ্ড করার র্পূণ অধিকারও দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি আওয়ামী লীগের জন্য সুযোগ করে দিয়েছিলেন বিশাল নির্ব্বাচনি বিজয়ের। পাকিস্তানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে মুজিবের মূল যুদ্ধের শুরু তো সেদিন থেকেই। ইয়াহিয়া সরকারের প্রচ্ছন্ন মদদে শেখ মুজিব ঢাকার পল্টন ময়দানে ফজলুল কাদের চৌধুরির মুসলিম লীগ, নূরুল আমীন সাহেবে পিডিপি এবং জামায়াতে ইসলামির ন্যায় প্রধান প্রধান দলের কোন নির্ব্বাচনী জনসভাই হতে দেয়নি। গর্ভনর হাউসের সামনে অবস্থিত এ ময়দানে আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা সেসব জনসভায় যেমন মানুষ খুন করেছে তেমনি শত শত মানুষকে আহতও করেছে।কিন্তু সে অপরাধে ইয়াহিয়া খানের সরকার আওয়ামী লীগের গুণ্ডাদের কাউকে গ্রেফতার করেনি,শাস্তিও দেয়নি।

মুজিবের যুদ্ধাপরাধ

তবে শেষ মুহুর্তে এসে শেখ মুজিবের আসল রূপ ইয়াহিয়া খানের কাছেও সুস্পষ্ট হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও তাঁর টিমের ধারণা জন্মে,আলোচনায় আওয়ামী লীগের কোনরূপ সততা নেই এবং অখণ্ড পাকিস্তান বাঁচানোর কোন ভাবনাও নাই। দুটি পক্ষ সর্ম্পূণ দুটো বিপরীত এজেণ্ডা নিয়ে আলোচনায় বসছিল যার মধ্যে কোনরূপ আপোষ সম্ভব ছিল না। ফলে সর্ম্পূণ ব্যর্থ হয় ইয়াহিয়া-মুজিব-ভূট্টো আলোচনা। ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন।আর পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয় রক্তাত্ব পথে। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য কে দায়ী তা নিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে বিবরণ নাই। যা আছে তা স্রেফ আওয়ামী লীগের নিজের ভাষ্য,যাতে প্রকৃত সত্য নেই। তাই আজও প্রশ্ন,কার অপরাধে দেশ সেদিন রক্তাত্ব হলো? প্রশ্ন হলো, আলোচনা ব্যর্থ হলে দেশ যে রক্তাত্ব পথে এগুবে সেটি কি শেখ মুজিবের জানতেন না? আলোচনা ব্যর্থ হলে দেশে যে ভয়ানক যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হবে সেটি মুজিব না বুঝলেও ইয়াহিয়া খান বুঝেছিলেন। সে যুদ্ধাবস্থা এড়াতেই তিনি ৬দফা মেনে নিয়েছিল।অপরদিকে শেখ মুজিব নিজে সরে দাঁড়িয়েছেন তাঁর ৬ দফা থেকে। অথচ ১৯৭০-এর নির্ব্বাচনে তিনি

ম্যান্ডেট নিয়েছিলেন ৬-দফার উপর,পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষে নয়। কিন্তু শেখ মুজিবের সমস্যা হলো ৬ দফার ম্যান্ডেটের বাইরেও তাঁর কাঁধে আরেকটি অর্পিত বড় দায়ভার ছিল। সেটি পাকিস্তান ভাঙ্গার। পাকিস্তান ভাঙ্গা নিয়ে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ না হলেও তা নিয়ে প্রচণ্ড দায়বদ্ধ ছিলেন দিল্লীর শাসকদের কাছে। ষাটের দশকে তিনি আগরতলা গিয়েছিলেন সে দায়বদ্ধতা পাকা করতে। ফলে শেখ মুজিবের ৬ দফা সেদিন এক দফাতে পরিনত হয়।

প্রশ্ন হলো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান না হয় ৬ দফাকে জনগণ-প্রদত্ত ম্যান্ডেট মনে করে মেনে নিতে পারেন,এবং মেনে নেয়ার পক্ষে গণতান্ত্রিক রায়ের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের ৬-দফা বিরোধীদের বুঝাতেও পারতেন। কিন্তু দেশবিভক্তির একদফাকে তিনি মেনে নিবেন কোন যুক্তিতে? দেশের প্রেসিডেন্টের উপর অর্পিত প্রধান দায়িত্বটা দেশের স্বাধীনতা ও সংহতির সুরক্ষা;স্বাধীনতা বিলিয়ে দেয়া নয়,দেশকে বিভক্ত করাও নয়। একাজ তো গাদ্দার বা মীরজাফরদের। অথচ মুজিব চাচ্ছিলেন,ইয়াহিয়া খানের দ্বারা সে গাদ্দারীই সাধিত হোক। কিন্তু ইয়াহিয়া খান সে পথে এগুননি। বিশ্বের সর্ব্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র তাঁর হাতে ধ্বংস হোক সে অপরাধ তিনি নিজ কাঁধে নিতে চাননি। দেশের এমন সংকটে সামান্য দেশপ্রেম আছে এমন মানুষও ভয়ানক যুদ্ধেরঝুঁকি নিজ কাঁধে তুলে নেয়। এমনকি সে যুদ্ধে নিজের মৃত্যু বা পরাজয়ও বরণ করে নেয়। নিজ দেশের সাথে গাদ্দারী সে মেনে নেয় না। মুজিবই বা কি করে বুঝলেন,পাকিস্তান ভাঙ্গার চেষ্টা হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নীরবে বসে শুধু আঙুল চুষবে?একাত্তরে পাকিস্তানে আর্মির সামনে বিশাল প্রতিবন্ধকতা ছিল। জনগণের বিরাট অংশ তাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। বড় বড় দুষমন ছিল আর্ন্তজাতিক মহলেও। ভয়ানক বন্যায় ধ্বসিয়ে দিয়েছিল দেশের অর্থনীতি ও যোগযোগ ব্যবস্থা। যুদ্ধের জন্য একাত্তর আদৌও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য উপযোগী ছিল না। কিন্তু এরপরও নীরব থাকার সুযোগ ছিল না। দেশ এরূপ বিভক্তির মুখে পড়লে যে কোন দেশের সেনাবাহিনীইহাতের কাছে যা কিছু পায় তা নিয়েই সাধারত ময়দানে নামে। পাকিস্তানের এমন একটি অবস্থার জন্য দায়ী মূলত শেখ মুজিব ও তাঁর দল। তিনি জেনে বুঝে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে একটিরক্তাত্ব যুদ্ধ,যুদ্ধজনীত বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এবং লজ্জাজনক পরাজয়ের দিকেই ধাবিত করেন। আর সে যুদ্ধেরক্তাত্ব হয় বাংলাদেশের মাটিও। মুজিব মূলত সেটিই চাচ্ছিলেন।

২৫শে মার্চে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মাঠে নামার আগেই শেখ মুজিব ৭ই মার্চে সহরোর্য়াদী উদ্যানের জনসভায় „এবারের যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ" বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যার যা সার্মথ আছে তা নিয়ে জনগণকে ময়দানে নামার আহবান জানিয়েছেন।„আমরা ওদেরকে ভাতে মারবো,পানিতে মারবো" বলে প্রতিশ্রুতি শুনিয়েছিলেন। তার সে ঘোষণার পর সেনাবাহিনীর ক্যান্টমেন্টগুলোতে খাদ্য-পানীয়র সরবাহ বন্ধ করা হয়েছিল। বহু বিহারী ও সেনা বাহিনীর বহু সদস্যকে সে সময় হত্যা করা হয়েছিল। যে কোন যুদ্ধই মানব জাতির বিরুদ্ধে ভয়ানক বড় অপরাধ।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধ নিয়ে নুরেমবার্গে যে আদালত বসেছিল সে আদালতের বিচারকদের সেটিই রায় ছিল। তাই যুদ্ধের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তত করা বা মানুষকে যুদ্ধে প্ররোচিত করাটাই যুদ্ধাপরাধ। শেখ মুজিব মুলত সেটিই করেছেন। হিটলার নিজ হাতে কোন শহরে বোমা ফেলেছেন বা কোন গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের পুড়িয়ে মেরেছেন সে প্রমাণ নাই। কিন্তু তাঁর প্ররোচনায় বহু জনপদ বিরাণ হয়েছে এবং বহু লক্ষ ইহুদী ও বহু দেশের বহু লক্ষ নিরাপরাধ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। তেমনি শেখ মুজিবের„আমরা ওদেরকে ভাতে মারবো,পানিতে মারবো" ঘোষণায় খুলনা,যশোর,শান্তাহার,পাকশী,কুষ্টিয়া,চট্টগ্রাম,ব্রাহ্মণবাড়িয়া,ময়মনসিংসহ বাংলাদেশের বহু জেলার হাজার হাজার বিহারী নিহত হয়েছে। বহু লক্ষ বিহারী নিজের বাড়ি ঘর হারিয়ে পথে বসেছে। অথচ এরূপ প্রত্যেকটি ঘটনাই ভয়ানক যুদ্ধাপরাধ। ইসলামে একজন মানুষ হত্যাই গুরুতর অপরাধ। আর দেশ হত্যা তো আরো গুরুতর অপরাধ।দেশহত্যার এরূপ গুরুতর অপরাধ ঠ্যাকাতে অতীতে হাজার হাজার

মুসলমানের প্রাণ দিতে হয়েছে।শেখ মুজিব ২৫ মার্চ জেলে গিয়ে উঠেছেন,কিন্তু পাকিস্তান ভাঙ্গার বাঁকী কাজটি সঁপেছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে। এবং জেল থেকে ফিরেই তিনি রেডিমেট ক্ষমতা পেয়েছেন। সেদিন লাভের ফসল একমাত্র ভারতই ঘরে তুলেছিল। সে লাভের বলেই ভারত আজ বিশ্বশক্তি হওয়ার পথে। ভারত সেদিন কইয়ের তেল কই ভেঝেছিল। সে যুদ্ধে বিশাল সম্পদহানী, প্রাণহানী ও ইজ্জতহানীর শিকার শুধু পাকিস্তানই হয়নি,বাংলাদেশও হয়েছে। একাত্তরের যুদ্ধের ফলেই বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী তলাহীন ভিক্ষার থলিচর উপাধি পায়। যুদ্ধে পরাজয়ের চেয়ে এটি কি কম অপমানজনক?

উম্মতে ওয়াহেদা হওয়ার কারণেমুসলমানদের গৌরবের ন্যায় তাদের পরাজয়েরওকোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ভূগোল নাই,এবং সেকারণে সীমা-সরহাদওনেই। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর আর্নল্ডটয়েনবীর ভাষায়,একটি সভ্যতার ইতিহাস একত্রে উঠানামা করে। সেটি যেমন পাশ্চাত্য সভ্যতার বেলায়, তেমনি মুসলিম সভ্যতার বেলায়ও। আরমহান আল্লাহর ভাষায় মুসলমান তো অভিন্ন উম্মাহর অংশ। আর পাক-ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস তো এক্ষেত্রে একসূত্রে বাঁধা। তাই ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাবী,সিন্ধি, বিহারী,বেলুচ,পাঠান ও গুজরাতিমুসলমানের সাথে বাঙালী মুসলমানের এক কাতারে স্বাধীনতার লড়াই করতে সমস্যা হয়নি।অবাঙালী সিরাজুদ্দৌলা বা বখতিয়ার খিলজিকেও তাই বাঙালী মুসলমানের ইতিহাস থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নাই। পাকিস্তানের জয়-পরাজয়ের ইতিহাস থেকেও তাই বাঙালী মুসলমান বিস্মৃত হতে পারেনা। কারণ পাকিস্তানের সৃষ্টির সাথে বাঙালী মুসলমানরা জড়িত। সে স্মৃতি ভূলে যাওয়া নাস্তিক বা ইসলামে অঙ্গিকারশূণ্য সেক্যুলারিস্টদের চেতনা হতে পারে,ঈমানদার মুসলমানের নয়। নবীজী (সাঃ)র হাদীস,মুসলিম উম্মাহ একটি দেহের মত,এক অংশে আঘাত লাগলে সে ব্যাথা অন্য অঙ্গও অনুভব করে। আরবদের বিভক্তি ও পরাজয় শুধু আরবদেরই শক্তিহীন ও ইজ্জতহীন করেনি,শক্তিহীন,ইজ্জতহীন এবং ব্যাথীত করেছে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকেই। তাই একাত্তরের যুদ্ধে শুধু পাকিস্তানের মুসলমানের পরাজয় ঘটেনি,তাতে দুর্ব্বল হয়েছে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ। বিশেষ করে উপমহাদেশের মুসলমান। সে পরাজয় নিয়ে ভারতসহ ইসলামের সকল বিপক্ষ শক্তির এজন্যই তো এতো উৎসব। তাই মুজিবের হাত দিয়ে অপমানের কালিমা সেদিন শুধু পাকিস্তানীদের মুখেই লাগেনি,লেগেছিল মুসলিম উম্মাহর মুখেও। ইসলাম ও বিশ্ব-মুসলিমের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব ও তাঁর অনুসারিদের এটাই বড় যুদ্ধাপরাধ।মুজিবের বিচার না হলেও ইতিহাসে তিনি যুগ যুগ বেঁচে থাকবেন অপরাধের সে গ্লানি বহন করেই। কারণ ইতিহাসের বিচার রুখবে কে? আওয়ামী লীগের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর কি সে সার্মথ আছে?

Reference:

Richard Sisson and Leo E. Rose, 1990; War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh,
University of California Press, Barkley and Los Angeles, California, USA.